

সাহিত্য পত্রিকা

আটত্রিশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা — কার্তিক ১৪০১

Vol. 38 | No. 1 | 1994



Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : প্রত্যয় ও প্রাতিস্মিকতা

Volume	38
Issue	1
Year	1994
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Biswajit Ghosh
Published online	October 1, 1994
DOI	10.62328/sp.v38i1.9
Link to article	https://doi.org/10.62328/ sp.v38i1.9
Pages	139-157
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : প্রত্যয় ও প্রাতিস্বিকতা

বিশ্বজিৎ ঘোষ

বাংলা সাহিত্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবির্ভাব প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও সামাজিক অবক্ষয়ের মধ্যে। এই সংকট ও হতাশার মধ্যেও বাংলা কথাসাহিত্যের খণ্ড-বিশ্বাসের স্রোতে অখণ্ড জীবনদৃষ্টির ব্যঞ্জনা নিয়ে এসেছেন বিভূতিভূষণ। যুগের সংকট ও নৈরাশ্যকে তিনি অতিক্রম করেছেন অখণ্ড জীবনদৃষ্টি, আধ্যাত্মবিশ্বাস ও বিশ্বাস্ত্রবোধের উপলব্ধি দিয়ে।

বিভূতিভূষণের মৌলবৈশিষ্ট্য অখণ্ড জীবনবোধ এবং এটি দিয়েই তাঁর রচনায় সন্ধান করেছেন চিরন্তন মানবানুভূতি। অবিকৃত মানবাত্মা ও মানুষের প্রতি গভীর বিশ্বাসের ছবি আছে তাঁর গল্প-উপন্যাসে। তাঁর সঙ্গে রয়েছে মহাকালচেতনা ও ইতিহাসবোধের প্রভাব। প্রকৃতি ও মানুষের সামঞ্জস্যের মধ্য দিয়েই বেড়ে উঠে তার চরিত্রগুলি। জীবনবীক্ষণের প্রশ্নে অকৃত্রিমতা ও সহানুভূতি-সিক্ত আত্মিক দৃষ্টিভঙ্গিই শতবর্ষের বাংলা সাহিত্যে বিভূতিভূষণের স্মারক।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে পৃথিবীব্যাপ্ত সামাজিক অবক্ষয়, অর্থনৈতিক বিপর্যয়, মূল্যবোধ বিচ্যুতি, মানবিক সম্ভাবনায় অবিশ্বাস এবং 'পোডোজমি'-তে 'ফাঁপা মানুষের' বিপন্ন-অস্তিত্বের প্রতিবেশে বাংলা সাহিত্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৪-১৯৫০) আবির্ভাব। সামূহিক ভাঙন এবং কালিক বৈনাশিকতার প্রেক্ষাপটে আবির্ভূত হয়েও যুদ্ধোত্তর বাংলা কথাসাহিত্যের খণ্ড-বিশ্বাসের শ্রোতে বিভূতিভূষণ নিয়ে এসেছেন অখণ্ড জীবনদৃষ্টির ব্যঞ্জনা। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে বাংলা সাহিত্য যখন যুদ্ধোত্তর হতাশা, বিভ্রান্তি ও সংশয়-জিজ্ঞাসায় ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন, তখন বিভূতিভূষণ সেখানে নিয়ে এলেন জীবন সম্পর্কে সুগভীর বিশ্বাস এবং অখণ্ড-অপরায়েয় মানবসত্তার নিগূঢ় উপলব্ধি। মানব-প্রগতির সারাৎসার এবং সহজাত হৃদয়ধর্মের ব্যঞ্জনা দিয়ে তাঁর সাহিত্য পাঠককে পৌঁছে দিল সংবেদনার জ্যোতির্ময়লোকে। অখণ্ড জীবনদৃষ্টি, অধ্যাত্মবিশ্বাস ও বিশ্বাত্মবোধের উপলব্ধি তাঁর ছিল বলেই, নিজেকে তিনি মুক্ত রাখতে পেরেছেন কালিক ভাব-উন্মাদনা, যৌনবিলাস, বিপ্লববাসনা এবং নৈরাশ্য-নৈঃসঙ্গ্যের অবক্ষয়-আবর্ত থেকে [গোপিকানাথ রায় চৌধুরী ১৯৮৯:১৭]। ফলে দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সংক্ষুব্ধ কালের লেখক হয়েও যুগধর্মের সঙ্কট কাটিয়ে তিনি নির্মাণ করেন 'শান্ত নির্লিপ্ত লিরিক সুরের নির্জন' জীবন, তাঁর সৃষ্টিসম্ভার হয়ে ওঠে জ্যোতির্ময় চেতনালোকে উত্তরণের শব্দসরণি।

ত্রিশোত্তর ভঙ্গুর-বিশ্বাস আর অসঙ্গতির গরল মন্থন-করে-আবির্ভূত-হওয়া বিভূতিভূষণ, বাংলা সাহিত্যে যথার্থ অর্থেই নিঃসঙ্গ স্বতন্ত্র অনন্যপূর্ব কথাকোবিদ। কেবল তাঁর কালিক প্রেক্ষাপটেই নয়, বর্তমান কালের বিচারেও তাঁর এই অপ্রতিমতা সমধিক লক্ষণীয়। বিশ শতকের চোখ দিয়ে বিভূতিভূষণের প্রাতিস্বিকতা বিচার করতে বসলে, প্রথমেই জেনে নেয়া প্রয়োজন তাঁর দেশ-কাল পটভূমি, সামসময়িক সাহিত্যিক প্রেক্ষাপট; কেননা, কালধর্মের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়াসম্ভূত চেতনাগুচ্ছের পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার্য বিশেষ কোনো শিল্পীর সৃষ্টিভূবন।

২.

বিংশ শতাব্দীর সূচনা থেকেই সমস্ত পৃথিবীতে নেমে আসে ডাঙা-গড়ার একটা প্রচণ্ড আবহ। অর্থনীতি-সমাজনীতি-রাষ্ট্রনীতি-বিজ্ঞান—সর্বত্র বৈপ্লবিক চিন্তা-ধারার প্রভাবে মানুষের জীবনদর্শন ও মূল্যবোধ সম্পর্কে পূর্বতন ধারণা ও প্রত্যয় বিপন্ন হয়ে যায়, ধসে যায় মানবিক মূল্যচেতনার ভিত্তিভূমি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এ-পরিস্থিতিকে করে তোলে আরো জটিল ও আসন্ন বিপর্যয়সম্ভব। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর

কালপ্রবাহে আধুনিক মানুষের কাছে সনাতন মূল্যবোধ ও প্রবহমান জীবনপ্রত্যয় তাৎপর্য হারায়। ফ্রেজারের নৃতত্ত্ব, ডারউইনের বিবর্তনবাদ, মার্কসীয় বিশ্ববীক্ষা, ফ্রয়েডের লিবিডো-তত্ত্ব—এইসব যুগান্তকারী তত্ত্ব ও মতবাদে ভেঙে যায় পূর্বতন মানবিক প্রত্যয় ও প্রমূল্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালপর্বে ইয়োরোপে বেকারত্ব-মুদ্রাস্ফীতি-অবক্ষয়-শূন্যতাবোধ ও অবিশ্বাস শিল্পী-সাহিত্যিকদের আক্রান্ত করে হতাশা ও বিচ্ছিন্নতার ক্ষয়রোগে। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার সমূহ বিপর্যয় মানুষকে নিক্ষেপ করে চরম অনিশ্চয়তার অন্ধকারে—অসহায় মানুষ ক্রমশ আশ্রয় নিতে থাকে আপন চিত্তবিবরে। ইয়োরোপ-এশিয়া-আফ্রিকা জুড়ে ফ্যাসিবাদী আগ্রাসন মানুষের অস্তিত্বকে করে তোলে উনুল। সাহিত্যে এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয় ইয়োরোপে, কিন্তু অচিরেই, বাংলা সাহিত্যেও উর্মিমুখর হয়ে ওঠে এইসব বৈশ্বিক বিপন্নতায়। মহাযুদ্ধ ধূলয় মিশিয়ে দেয় ভিত্তোরীয় প্রসন্ন জীবন-প্যাটার্ন। যুদ্ধোত্তর 'পোড়োজমি'-তে দাঁড়িয়ে টি. এস. এলিয়ট উচ্চারণ করলেন সভ্যতার অত্যাঙ্গন পতন-কথা। তাঁর 'ফাঁপা-মানুষের' অন্তর-যন্ত্রণা উন্মোচিত হলো *দ্য ককটেল পার্টি*-র সিলিয়ার উচ্চারণে; বস্তুত, যে-উচ্চারণ ছিল প্রথম সমরোত্তর কালে মানবসভ্যতার বিপন্নতা-বিসঙ্গতি-বিভঙ্গতা-বিযুক্তির শব্দচিত্র:

... I've always been alone. That one always is alone...

No. ... it isn't that I want to be alone.

But that everyone's alone—or so it seems to me.

They makes noises, and think they are talking to each other ;

They make faces, and think they understand each other.

And I'm sure that they don't

[Eliot, ১৯৬৭ : ১৮৬]।

বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো ইয়োরোপে, কিন্তু তার প্রভাব পড়েছিলো সমগ্র পৃথিবী জুড়ে, বাংলাদেশও এই প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার বাইরে ছিল না। বিশ্বযুদ্ধ ভারতবর্ষের জন্যেও নিয়ে এসেছিলো কালান্তরের আভাস। প্রমথ চৌধুরী যথার্থই বলেছেন, “গত যুদ্ধের প্রবল ধাক্কায় সমাজের কি আর্থিক, কি রাজনৈতিক সকল ব্যবস্থারই গোড়া আলগা হয়ে গেছে।” যুদ্ধোত্তর কালে জাতীয় জীবনে নানা বিপর্যয় ও সংক্ষেভের ফলে বাংলার যুবচিত্ত হয়ে উঠেছিলো অশান্ত, বিহ্বল ও রিক্ত-আশ। প্রচলিত মূল্যবোধ সম্পর্কে সংশয় ও জিজ্ঞাসা দেখা দিল তাদের

জীবনচেতনায়। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন (১৯০৫-১৯১১), সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন প্রভৃতি ঘটনা যুদ্ধপূর্ব কালেই তাদের করে তুলেছিলো অস্থির, অশান্ত ও উন্মূলিত। এই অস্থিরতা-সংশয়-জিজ্ঞাসা-হতাশা যুদ্ধোত্তর বাংলা কথাসাহিত্যের মৌল বিষয় হিসেবে হলো স্বীকৃত। আলোচ্য কালখণ্ডে বাংলা সাহিত্যে যাঁরা আবির্ভূত হলেন, বিনাশী যুগধর্মের প্রভাবে তাঁদের রচনায় স্বভাবতই প্রকট আকারে দেখা দিয়েছে বিচ্ছিন্নতার সমস্যা, অস্তিত্বসঙ্কটের যন্ত্রণা। বিশ্বব্যাপী অবক্ষয়ী পুঁজিবাদের অভ্যন্তর সঙ্কটের ফলে আমাদের সাহিত্যেও সক্রিয় নায়কের (positive-hero) বদলে দেখা দিতে লাগলো অনুভূতিসর্বস্ব নিষ্ক্রিয় অ-নায়কের (anti-hero) দল। বিশ্বযুদ্ধকালীন বা তার অব্যবহিত পরবর্তী বাংলা কথাসাহিত্যে প্রতিফলিত হলো বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্লীন চেতনা—যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ছবি নয়, তার অনিবার্য বহিরঙ্গ বা মানস-প্রতিক্রিয়া। মানুষের বহিরঙ্গের অনুপুঞ্জ বিবরণধর্মী বাস্তবতার পরিবর্তে অন্তর্জীবন বাস্তবতার (inner-reality) সন্ধান, অবচেতন আকাঙ্ক্ষার রূপায়ণ, চরিত্র-অঙ্কনের পরিবর্তে ব্যক্তির আত্মবিশ্লেষণ (search for identity), চেতনাপ্রবাহ (stream of consciousness) কিংবা মনোকথন (interior monologue) রীতির ব্যবহার, প্রচলিত সময়-ধারণার পরিবর্তে সময়ের ভগ্নক্রম বিন্যাস, সূক্ষ্ম সংকেত-প্রতীক ও নিগূঢ় চিত্রকল্পের ব্যবহার— এইসব কুললক্ষণে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা সাহিত্য, সূচিহিত।

সিগমুন্ড ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্ব-বিষয়ক নতুন-নতুন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বিশ্বসাহিত্যের মতো বাংলা সাহিত্যেও, বিশেষত কথাসাহিত্যে, নিয়ে আসে আমূল পরিবর্তন। তাঁর *The Interpretation of Dreams* (১৯১৩), *The Psychology of Everyday Life* (১৯১৪) প্রভৃতি গ্রন্থ মানুষের যৌনতাবিষয়ক প্রচলিত নীতিবোধ ধূলিসাৎ করে দেয়। হ্যাভলক এলিসের ছয়-খণ্ডে সম্পূর্ণ *Studies in the Psychology of Sex* (১৮৯৭-১৯২৮) গ্রন্থও যৌনতাসংক্রান্ত সনাতন ধারণায় নিয়ে আসে আমূল পরিবর্তন। ফ্রয়েড-এলিস দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বাঙালি কথাকার মানুষের অবচেতন যৌনকামনার শিল্পরূপ-সৃজনে হয়ে উঠলেন অতি-উৎসাহী। যুদ্ধ-পরবর্তী বাংলা কথাসাহিত্যে এ-প্রভাব পরিলক্ষিত হলো ব্যাপকভাবে। উনিশ শতকী বিশুদ্ধ প্রেমধারণার স্থলে অবচেতন দেহকামনার আরতিতে মুখর হলো আমাদের কথাসাহিত্য।

বিশ্বযুদ্ধোত্তর স্বৈর-বৃত্ত কালখণ্ডে, সামগ্রিক এই সমাজ-পটভূমিতে, তরুণতর লেখকগোষ্ঠী নতুন পরিচয় নিয়ে আবির্ভূত হলেন বাংলা সাহিত্যে। যদিও বাংলা সাহিত্যের মধ্যগগনে তখনও বিরাজ করছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আছেন সেখানে অন্ত্যাজ-পতিত মানুষের কথাকার শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু ঔপনিষদীয় দর্শন-

পরিস্ৰুত সর্বমাস্কলিক রৈবিকচেতনা কিংবা বাঙালির আবেগ-জীবনের নব্যনীতিবাদী শরৎচন্দ্রীয় শিল্পমাধুর্যে যুদ্ধপরবর্তী নবীন শিল্পীরা বিশ্বাস স্থাপন করতে পারলেন না, তাঁরা নিমজ্জিত হলেন বিকৃতি ও বিসঙ্গতির পঙ্কে—রচিত হলো পঙ্কতিলক (১৯১৯), পাপের ছাপ (১৯২২), পাঁক (১৯২৬), 'বেদে' (১৯২৮) প্রভৃতি উপন্যাস। মূল্যবোধ-নৈতিকতা-দেশাচার ও বিশ্বাসবিচ্যুৎ তরুণ শিল্পীদের রচনায় রূপান্তিত হলো মানুষের অবচেতন মৌনাকাঙ্ক্ষা, মধ্যবিত্তজীবনের বহুমাত্রিক অসঙ্গতি ও অনন্বয়, সমাজের নীচুতলার অবজ্ঞাত-অপজাত মানুষের আদিম-বাসনা ও সংগ্রামশীলতা, মানুষের অস্তিত্বসঙ্কট ও অস্তিত্বমুক্তির ইতিকথা। পুরোনো মূল্যবোধ ভেঙে যাচ্ছে, অথচ সমাজে দেখা দেয়নি নতুন মূল্যচেতনা—এই জটিল অবস্থায় যুদ্ধোত্তর শিল্পীরা হয়ে পড়লেন ত্রিশঙ্কলোকের অধিবাসী। কল্লোল (১৩৩০)- কালিকলম (১৩৩৩)- প্রগতি (১৩৩৪) পত্রিকাকে কেন্দ্র করে আবির্ভূত হয়েছিলেন তরুণতর এই শিল্পীগোষ্ঠী। জগদীশ গুপ্ত কি শৈলজানন্দ, একজন বুদ্ধদেব কি একজন অচিন্ত্যকুমার-প্রেমেন্দ্র মিত্র-মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে নিয়ে এলেন কালান্তরের ব্যঞ্জনা। কল্লোল পত্রিকা ছিলো এঁদের আত্মপ্রকাশের মৌলবাহন, তাই এঁরা অভিহিত হলেন কল্লোলগোষ্ঠীর লেখক হিসেবে, আর সাহিত্যের ইতিহাসে এই প্রবণতা আখ্যা পেল 'কল্লোলচেতনা' অভিধায়। কল্লোলচেতনার মৌলচারিত্র্য বুদ্ধদেব বসুর ব্যাখ্যায় ধরা পড়েছে এভাবে:

অতি-আধুনিক সাহিত্যকে post-war সাহিত্য বললে ভুল হয় না। আধুনিক লেখকরা post-war সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার ভিতর দিয়ে বড় হয়ে উঠেছেন। লড়াইয়ের ফলে ইয়োরোপের যে-দুরবস্থা হয়েছে ও মানুষের চিন্তা-জগতে যতটা পরিবর্তন এসেছে, আমাদের দেশে তা'র চেয়ে অনেক কম হ'লেও ঊনবিংশ শতাব্দীর তুলনায় আমাদের দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্যের পরিমাণ ও মনের ভাব-ধারার গতি সম্পূর্ণ বদলে গেছে। আধুনিক লেখকরা শিশুকাল থেকে যে-অর্থনৈতিক সঙ্কটের সহিত চাক্ষুস পরিচয় লাভ করছেন, বঙ্কিমবাবুর সুজলা-সুফলা; শস্য-শ্যামলা দেশমাতা বা রবীন্দ্রনাথের সোনার বাঙলায় তা'র চিহ্নমাত্র ছিল না। বুদ্ধদেব বসু ১৯৮২ : ৫৬২-৬৩।

কল্লোলচেতনার আর একটি প্রধান লক্ষণ রবীন্দ্রবিরোধিতা। রবীন্দ্রনাথের সুস্থিত সুবেদী প্রসন্ন মঙ্গলময় জীবনচেতনায় এঁরা নির্ভর করতে পারেন নি। সাহিত্য যেহেতু সময়সচেতন ও সমকালশাসিত স্রষ্টার অভিজ্ঞতা-স্নিগ্ধ জীবনের

আগ্নেয় উদ্ভাসন, তাই স্বভাবতই তাঁরা রবীন্দ্রদর্শনের প্রতি হলেন বীতশ্রদ্ধ, সরব ঘোষণা দিয়েই তাঁরা অতিক্রম করতে চাইলেন রবীন্দ্রনাথকে। সমকালের শিথিল-প্রত্যয়, অনিকেত-ভাবনা, অস্থির-চিন্তা এবং সংক্ষুব্ধ যুবমানসের কাছে রবীন্দ্রনাথ আর অপরিহার্য এবং 'যুগোপযোগী' বলে মনে হলো না। কল্লোলচেতনা সম্পর্কে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ভাষ্য এখানে স্মরণীয়:

রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে এসেছিল 'কল্লোল'। সরে এসেছিল অপজাত ও অবজাত মনুষ্যত্বের জনতায়। নিম্নগত মধ্যবিস্তদের সংসারে। কয়লাকুঠিতে, খোলার বস্তিতে, ফুটপাতে প্রতারিত ও পরিত্যক্তের এলাকায় [অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ১৯৮৭ : ৪৭]।

১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লব এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা মানব-সভ্যতার ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। বিশ্বব্যাপী প্রভাবসঞ্চারী এই বিপ্লব সমাজনীতি-রাষ্ট্রনীতি-অর্থনীতি এবং শিল্প-সংস্কৃতির বিকাশকে নবতর মাত্রায় ঋদ্ধ করে, করে রূপান্তরিত। বাংলা সাহিত্যেও এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয় যুদ্ধোত্তর কাল-পর্বে। এ-সূত্রেই স্মরণীয় কাজী নজরুল ইসলাম, বিবর্তিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে, সুকান্ত ভট্টাচার্য, সোমেন চন্দ্র প্রমুখ শিল্পী-সাহিত্যিকের নাম। যুদ্ধোত্তর পর্বে বিশ্ব-পুঁজিবাদের অবক্ষয়ী প্রভাবে শিল্প-সাহিত্যে বিচ্ছিন্নতা-হতাশা-ব্যর্থতা-বিপন্নতা-নেতির উল্লাসের মাঝেও সদর্শক জীবনচেতনার রূপায়ণ আমরা লক্ষ করি কোন-কোনো লেখকের সৃষ্টিকর্মে। এই সমাজতান্ত্রিক ধারা নবতর মাত্রা অর্জন করে ১৯৩৬ সালে সংঘটিত প্যারিসের ফ্যাসিবাদ বিরোধী লেখক সম্মেলনের মাধ্যমে। ফ্যাসিবাদের বি-মানবিকতার থাবা থেকে মানবজাতিকে রক্ষা করার জন্য বিশ্বব্যাপী প্রগতিশীল-গণতান্ত্রিক-মানবতাবাদী শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীরা একজোট হয়ে অবতীর্ণ হন সংগ্রামে। বাংলাদেশেরও অনেক শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী আন্তর্জাতিক এই আন্দোলনের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করেন। এই আন্দোলনের প্রভাবে যুদ্ধোত্তর বাংলা সাহিত্যে, সামূহিক নেতি আর নাস্তির মাঝেও, সংযোজিত হয় নতুন এক মাত্রা।

৩.

জিজ্ঞাসা-সংশয়-অবক্ষয়-হতাশা-অসঙ্গতি এবং বিপ্লব-উন্মাদনার উপর্যুক্ত কালখণ্ডেই বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। অতএব, উক্ত প্রেক্ষাপটেই অনুসন্ধান করা প্রয়োজন বিভূতিভূষণের স্বাতন্ত্র্যের স্বরূপ। বিভূতি-

ভূষণের ছোটগল্প ও উপন্যাস, এমন-কি তাঁর দিনলিপিগুলোও, একক মুহূর্তের অণুবিশ্বে সংহত হয়ে নির্মাণ করেছে জীবন-উপলব্ধির এক গভীর ধ্রুপদী ব্যঞ্জনা। মানবাত্মার জয়গান আর মানবিক উত্তরণের আকাঙ্ক্ষায় ঋদ্ধ বিভূতিভূষণের সৃষ্টিজগৎ। পরিবর্তমান সময়ের স্রোতে মানবাত্মার শাস্ত্রত আবেদন এবং স্নেহ-প্রেম-ভালোবাসায় জড়ানো জীবন অনন্তে হারিয়ে যায়, গল্প-উপন্যাসে সেই হারিয়ে-যাওয়া-জীবনই সন্ধান করেছেন বিভূতিভূষণ। তাঁর সাহিত্যে প্রকৃতি মানুষের কাছে উপস্থিত হয়েছে বিশল্যকরণী সত্তায়, সঙ্কটদীর্ঘ জীবনে তা বুলিয়ে দেয় প্রশান্তির প্রলেপ। বস্তুত, মানুষ ও নিসর্গের মাঝে তিনি নির্মাণ করেছেন আত্মীয়তার সেতুবন্ধ। গ্রামীণজীবন, নিসর্গবৈচিত্র্য, শাস্ত্রত মানবপ্রেম—প্রভৃতি অনুযঙ্গ যেমন তাঁর সাহিত্যে শিল্প-উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, তেমনি ব্যবহৃত হয়েছে অলৌকিক কোনো ঘটনা, অতিপ্রাকৃত বিশ্বাস কিংবা আধ্যাত্মিক কোনো উপলব্ধি। বস্তুত, মানুষ-প্রকৃতি-পরজগৎ—এই তিন মিলেই বিভূতিভূষণের সৃষ্টিভূবন। এই ত্রিমাত্রিক অনুম্বঙ্গের মিথক্রিয়ায় বিভূতিভূষণের সাহিত্যে আমরা লক্ষ করি এইসব প্রবণতা—আপাত-তুচ্ছ জীবনের তাৎপর্যসন্ধান, স্নেহ-মমতা-মৃত্তিকাতৃষ্ণা, স্মৃতিমুগ্ধতা, চিরন্তন মানবানুভূতি, কালপ্রবাহচেতনা, অধ্যাত্মভাবনা এবং প্রকৃতিমুগ্ধতা। মোটারেখায় অঙ্কিত এইসব প্রবণতাই, সমকালের পটভূমিতে এবং শতাব্দীর প্রেক্ষাপটে, বিভূতিভূষণের স্বাতন্ত্র্যের স্মারক।

৩.১

অখণ্ড জীবনবোধই বিভূতিভূষণের জীবনার্থের মৌলবৈশিষ্ট্য এবং এই অখণ্ড জীবনবোধ দিয়েই তিনি তাঁর গল্পে-উপন্যাসে-দিনলিপিতে সন্ধান করেছেন চিরন্তন মানবানুভূতি। কোনো তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটে নয়, কোনো দর্শনশাসিত শুদ্ধাচারী পথে নয়, বরং সহানুভূতিসিক্ত আত্মিক দৃষ্টিকোণের আলোয় তিনি নির্মাণ করেছেন মানবাত্মার অপরাডেয় গৌরব গাথা। বিকৃতি-বিসঙ্গতি-লোভ-প্রলোভন ও রিরংসা থেকে দূরবর্তী প্রবহমান জীবনস্রোতে অপরাডেয় মানবসত্তার সন্ধানই বাংলা সাহিত্যে বিভূতিভূষণের সবচেয়ে বড় স্বাতন্ত্র্য। সামসময়িক শিল্পী-সাহিত্যিকরা জীবনকে যেখানে দেখেছেন নেতি আর নাস্তির উল্লাস রূপে, বিভূতিভূষণের কাছে জীবন সেখানে হয়ে ওঠে মানবপ্রগতির সারাৎসারের প্রবর্ধমান সৃষ্টি-উৎস। তিরিশের অন্য সব উপন্যাসিকের মতো মানুষের সংসারে তিনি দেখেননি নৃশংস অমানবিকতা ও মনুষ্যত্বহীনতা, তাঁদের মতো তিনি বিহার করেননি উত্তর-রেনেসাঁস অমানবতন্ত্রী সাহিত্য-আকাশে—তাই তাঁর কথাসাহিত্যে পাওয়া যায় না কোনো খল-নায়কের সাক্ষাৎ, বরং দেখি জন্ম-জন্মান্তরের আত্মনিষ্ঠ পথিক-সত্তা

দিয়ে তিনি নির্মাণ করেন মানবের মূলগত ঐক্যসূত্র, মানুষের সব সদর্শক গুণ, তার আত্মার নির্যাস, সত্তার সৌরভ। *কল্লোল-কুণ্ডলী*তে মানবাত্মা হয়ে পড়েছিলো বিকৃত, কিন্তু বিভূতিভূষণের সাহিত্য আমাদের শোনায এই কথা—মানবাত্মার কোনো বিকৃতি নেই। মানুষের প্রতি এই যে গভীর বিশ্বাস, এখানেই নিহিত তাঁর স্বাতন্ত্র্য-বীজ। এমন-কি প্রাচীন ঋষির মতো স্থিত-প্রাজ্ঞ রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন—‘মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ’—তখন আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, যুগধর্মের বৈনাশিকতায় তাঁর অটল বিশ্বাস ও ঔপনিষদীয় মূল্যবোধ ‘অন্তর-বাহিরের দ্বন্দ্ব’ হয়তো-বা হয়ে উঠেছিলো সন্দিগ্ধ; কিন্তু কী আশ্চর্য, বিভূতিভূষণের সাহিত্যে একবারের জন্যেও উচ্চারিত হয়নি মানবাত্মার প্রতি এই সন্দিগ্ধতা, এই সংশয়। অসীম অতল অপরিণাম সহানুভূতি দিয়ে তিনি বিবেচনা করেছেন মানুষকে, মানুষের সমগ্র স্বরূপকে। নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিপুঞ্জ বিভূতিভূষণের মানবপ্রেমের এ-সব বৈশিষ্ট্য উদ্ভাসিত—

ক. [১৯২৯]

পথের দেবতা প্রসন্ন হাসিয়া বলেন—মূর্খ বালক, পথ তো আমার শেষ হয়নি তোমাদের গ্রামের বাঁশের বনে, ঠ্যাঙাড়ে বীরু রায়ের বটতলায় কি ধলচিতের খেয়াঘাটের সীমানায়? তোমাদের সোনাডাঙা মাঠ ছাড়িয়ে, ইছামতী পার হয়ে, পদ্মফুলে ভরা মধুখালি বিলের পাশ কাটিয়ে, বেত্রবতীর খেয়ায় পাড়ি দিয়ে, পথ আমার চলে গেল সামনে, সামনে, শুধুই সামনে ... দেশ ছেড়ে বিদেশের দিকে, সূর্যোদয় ছেড়ে সূর্যাস্তের দিকে, জানার গণ্ডী এড়িয়ে অপরিচয়ের উদ্দেশ্যে...

দিন রাত্রি পার হয়ে, জন্ম মরণ পার হয়ে, মাস, বর্ষ, মন্বন্তর, মহাযুগ পার হয়ে চ’লে যায় ... তোমাদের মর্মের জীবন-স্বপ্ন শেওলা-ছাতার দলে ভ’রে আসে, পথ আমার তখনও ফুরোয় না... চলে... চলে... এগিয়েই চলে ...

[পথের পাঁচালী/পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ]

খ. [১৯৩২]

ইছামতী এই চঞ্চল জীবনধারার প্রতীক। ওর দু’পাড় ভরিয়া প্রতি চৈত্র বৈশাখে কত বনকুসুম, গাছপালা, পাখি-পাখালি, গাঁয়ে গাঁয়ে গ্রামের ঘাট—শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া কত ফুল ঝরিয়া পড়ে, কত পাখির দল আসে যায়, ধারে ধারে কত জেলেরা জাল ফেলে, তীরবর্তী গৃহস্থবাড়ীতে হাসি-কান্নার লীলাখেলা হয়, কত গৃহস্থ আসে,

কত গৃহস্থ যায়— কত হাসিমুখ শিশু মায়ের সঙ্গে নাহিতে নামে, আবার বৃদ্ধাবস্থায় তাদের নশ্বর দেহের রেণু কলস্বনা ইছামতীর স্রোতের জলে ভাসিয়া যায়—এমন কত মা, কত ছেলেমেয়ে, তরুণ-তরুণী মহাকাালের বীথিপথে আসে যায়—অথচ নদী দেখায় শান্ত, স্নিগ্ধ, ঘরোয়া নিরীহ ।...

[অপরাঞ্জিত । ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ]

গ. [১৯৩৮]

রাধা কি বুঝিল, কি পাইল জানি না —কিন্তু এ কথা খুবই সত্য যে, মেল গাড়িখানা ছাড়িয়া গেলে রাধা দেখিল যে, সে যেন নতুন মানুষ হইয়া গিয়াছে। মনে নতুন উৎসাহ, হাতে পায়ের নতুন বল, চোখে নতুন ধরনের দৃষ্টি। সে যেন রাধা নয় — যে সংসারে অসহায়, অনাহৃত, উপেক্ষিত, অবলম্বনহীন —।

['ডাকগাড়ী' / জন্ম ও মৃত্যু]

ঘ. [১৯৩৯]

... ক্যাম্বেল স্কুলটার সামনে দিয়ে যেতে যেতে মনে হল, মানুষ অনন্তের সন্তান— একথা মিথ্যা নয়, কে বলে মিথ্যা ! ... সমগ্র নক্ষত্র জগতের জীবন— জরাহীন, মৃত্যুহীন, অপরায়ে জীবন-ধারা তার নিজস্ব । ... এই বড় জীবনটা আমার ... । মানুষের মনে এই জ্ঞানটা শুধু পৌঁছে দিতে হবে যে, সে ছোট নয়, সে বড়, সে অনন্ত । যদি যুগে যুগে আসি যাই তা হলেও তো ওরকম কত কালবৈশাখী, কত মুচুকুন্দ চাঁপার গন্ধ, কত টক কলাইয়ের ডাল আমার হবে ।

[তৃণাকুর]

ঙ. [১৯৫০]

... কত লোকের চিতার ছাই ইছামতীর জল ধুয়ে নিয়ে গেল সাগরের দিকে, জোয়ারে যায় আবার তাঁটায় উজিয়ে আসে, এমনি বার বার করতে করতে মিশে গেল দূর সাগরের নীল জলের বুকে । ... কত তরুণী সুন্দরী বধূর পায়ের চিহ্ন পড়ে নদীর দু'ধারে, ঘাটের পথে, আবার কত শ্রোঁটা বৃদ্ধার পায়ের দাগ মিলিয়ে যায় ... গ্রামে গ্রামে মঙ্গলশঙ্খের আনন্দধবনি বেজে ওঠে বিয়েতে, অনুপ্রাশনে, উপনয়নে, দুর্গাপূজায়, লক্ষ্মীপূজায় ... সে সব বধূদের পায়ের আলতা ধুয়ে যায় কালে কালে, ধূপের ধোঁয়া ক্ষীণ হয়ে আসে ... মৃত্যুকে কে চিনতে পারে, গরীয়সী মৃত্যু মাতাকে ?

ওদের সকলের সামনে দিয়ে ইছামতীর জলধারা চঞ্চলবেগে বয়ে চলেচে বড় লোনা গাঙের দিকে, সেখান থেকে মোহানা পেরিয়ে, রায়মঙ্গল পেরিয়ে, গঙ্গাসাগর পেরিয়ে মহাসমুদ্রের দিকে। ...

[ইছামতী]

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিপঞ্চকেই মানবজীবন সম্পর্কে বিভূতিভূষণের সদর্থক ভাবনা সুপ্রকাশিত। প্রতিটি উদ্ধৃতিতেই প্রবহমানতার প্রেক্ষাপটে বিভূতিভূষণ সন্ধান করেছে মানবাত্মার অপরাজেয় গৌরবগাথা। পথের পাঁচালী-অপরাজিত-আরণ্যক-ইছামতী প্রভৃতি উপন্যাসে বহমান সময়ের প্রেক্ষাপটে মানবাত্মার স্বরূপ অঙ্কন করেছেন বিভূতিভূষণ। তাঁর অপু, জিতু কিংবা অন্য যে-কোনো চরিত্র কেবল ব্যক্তি নয়, বরং তারা কালের স্রোতে ভাসমান একজন মানুষের মনের কথার প্রতীকী-রূপ। অবশ্য এ-ক্ষেত্রে অপুই হয়ে ওঠে বিভূতিভূষণের জীবনার্থের প্রতীকী-চরিত্র। কেননা, গতিশীল সময়ের প্রেক্ষাপটে দ্বন্দ্বপীড়িত নিঃসঙ্গ অপু বিভূতিভূষণের মতোই ছিল 'মানসক্রিয়ায় সংগ্রামশীল, বিশ্বাসে-আদর্শে সত্য-অভিপ্রায়মুখী, সমকালীন পঙ্কযাত্রা-বিমুখ এবং অবশেষে এক অপরাজিত চেতনান্তরে উত্তীর্ণ সৈয়দ আকরম হোসেন ১৯৮৫:৮৬)।

তিরিশোত্তর কালের অন্য কথাকাররা যেখানে নাগরিক মধ্যবিত্তজীবন কিংবা অপজাত-অবজ্ঞাত অন্ত্যজ মানুষ নিয়ে সাহিত্য রচনা করেছেন, বিভূতিভূষণ সেখানে শিল্পিত করেছেন চিরন্তন মানববৈচিত্র্য। তাঁর ছোটগল্পে-উপন্যাসে বিচ্ছিন্নতা-নিঃসঙ্গতা-নির্বৈদ-নৈরাশ্যের কালো জলে নিমজ্জিত চরিত্রের পৌনঃপুনিক উপস্থিতি লক্ষ করি না, বরং সেখানে পাই বিচিত্র ধরনের নর-নারীর সাক্ষাৎ— যারা একক জীবনপটে হয়ে ওঠে সহস্র জীবনের প্রতিভূ, বিশেষ থেকে নির্বিশেষ, individual থেকে universal। মানবচরিত্রের বহুমুখী প্রবাহ তাঁর কবিদৃষ্টির উৎসমুখে এসে সৃষ্টি করেছে মহামানবের চিরায়ত ঐকতান। এই ঐকতানে মিশেছে ধনী জমিদার, মধ্যবিত্ত মানুষ, আরণ্যক রাজা, স্বপ্নদর্শী কিশোর, গরিব কথক, রিক্ত-আশ স্কুলশিক্ষক হোটেলের কি, দুঃচরিত্র শয়তান, অরণ্যবাসী আদিম নর-নারী— সকলের মিলিত স্বরগ্রাম। তাই তাঁর অপু কিংবা জিতু অথবা মঞ্চী-ভানুমতী-কুস্তা-মটুকনাথ-যুগলপ্রসাদ-যদু মাস্টার-মালতী-দুর্গা-পদ্ম কিংবা ইন্দির ঠাকুরণ—মহাকালের সচল প্রাণপ্রসঙ্গে এরা সবাই এক একটি অবিশ্বরণীয় নাম। একটি বিশেষ জীবন-প্যাটার্নে সীমাবদ্ধ না থেকে, এইভাবে বিভূতিভূষণ মানববৈচিত্র্যকে অন্তর্গত সহানুভূতি দিয়ে শিল্পিত করেছেন। চিরন্তন মানবানুভূতিরসে জারিত তাঁর চরিত্রবলি নিছক বৈচিত্র্যহীন পুনরাবৃত্তি নয়, যে-পুনরাবৃত্তি দেখি তিরিশের কথাশিল্পে— বিভূতিভূষণের মানুষেরা জীবনবোধের স্বাতন্ত্র্যে, আনন্দ-

বেদনার উষ্ণ-স্পর্শে এবং আশা-আকাজক্ষা ও আশ্বাসের শাস্বত টানাপোড়েনে প্রত্যেকেই এক অনুপম অদ্বিতীয় স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা।

৩.২

কেবল প্রবহমান মানবানুভূতির পরিপ্রেক্ষিতেই নয়, মহাকালচেতনা ও ইতিহাসবোধের আলোকে জীবনের শিল্পরূপ সৃজনেও বিভূতিভূষণ রেখেছেন প্রাতিশ্বিকতার স্বাক্ষর। মানুষকে ইতিহাসের নির্মম শিকারে পরিণত না করে, তিনি বরং ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে মানুষের অপরাজেয় সত্তা আবিষ্কারের সাধনা করেছেন। বিভূতিভূষণের দৃষ্টিকোণে ইতিহাস হচ্ছে সময়ের স্রোত। তাঁর মতে, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুই ভেসে যায় সময়ের স্রোতে এবং এই সময়স্রোতের প্রেক্ষাপটেই উপলব্ধি করতে হবে জীবনকে জগৎকে। নিসর্গপ্রকৃতি, নর-নারীর সুখ-দুঃখ-হাসি-কান্না-আনন্দ-বেদনা— সবকিছুই পরিবর্তমান কালপ্রবাহে ভেসে যাচ্ছে, বিভূতিভূষণের কাছে পরিবর্তমান এই কালচেতনার প্রতীক হচ্ছে চির-বহমান ইছামতী। তিরিশের কথাকাররা জীবনকে শিল্পিত করতে গিয়ে যেখানে প্রধানত নির্ভর করেছেন micro-time-এর উপর, বিভূতিভূষণ সেখানে macro-time-এর বিশাল ডানায় ভর করে দূরপ্রসারী ইতিহাসের উৎসধারা থেকে জীবনকে তুলে আনেন বর্তমানের সীমানায়। সদর্থক এই ইতিহাসজ্ঞান ছিল বলেই বিভূতিভূষণ কখনো পথভ্রষ্ট হননি, macro-time-এর চোখে মানুষকে দেখেছেন বলে জীবনের উপর কখনো পতিত হয়নি খণ্ড-দৃষ্টি। কেবল তিরিশের পটভূমিতেই নয়, গোটা বিশ শতকের প্রেক্ষাপটেই বিভূতিভূষণের এই অখণ্ড ইতিহাসদৃষ্টি সবিশেষ লক্ষণীয়। অখণ্ড ইতিহাসচেতনার ফলে বিভূতিভূষণের উপন্যাস বা ছোটগল্প কোনো ব্যক্তি-বিশেষের জীবনকথা না হয়ে হয়ে-ওঠে মহাকালশাসিত মানবজীবনের অন্তরানুভূতির ইতিকথা। আপাতদৃষ্টিতে বিভূতিভূষণকে রোম্যান্টিক সৌন্দর্যপ্রিয় প্রকৃতিমুগ্ধ ভাববাদী কথাকার বলে মনে হতে পারে, অনেক সমালোচক সে-দৃষ্টি দিয়েই বিচার করেছেন তাঁকে; কিন্তু গভীরতর পর্যবেক্ষণে বলতেই হয়, তাঁর রচনায় সমকালচিন্তা ও কাললগ্নতার স্বাক্ষর সুস্পষ্ট। বিভূতিভূষণের শিল্পিসত্তায় সর্বদা সংগোপনে সক্রিয় ছিল ইতিহাসবোধ। নিম্নোক্ত উদ্ধৃতসমূহ তাঁর ইতিহাসচেতনার নির্ভুল স্বাক্ষরবাহী:

ক. [১৯২৯]

তাহার পর অনেক দিন হইয়া গিয়াছে। শাঁখারীপুকুরে নাল ফুলের বংশের পর বংশ কত আসিয়াছে, চলিয়া গিয়াছে। চক্রবর্তীদের ফাঁকা মাঠে সীতানাথ মুখুয্যে নতুন কলমের বাগান বসাইল এবং সে সব গাছ আবার বুড়া হইতেও চলিল। কত ভিটা

নতুন গৃহস্থ বসিল কত জনশূন্য হইয়া গেল, কত গোলক চক্রবর্তী, ব্রজ চক্রবর্তী মরিয়া হাজিয়া গেল, ইছামতীর চলোর্মি-চঞ্চল স্বচ্ছ জলধারা অনন্ত কালপ্রবাহের সঙ্গে পান্না দিয়া কুটার মত, ঢেউয়ের ফেনার মত, গ্রামের নীলকুঠির কত জনসন টম্‌সন সাহেব, কত মজুমদারকে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গেল!

[পথের পাঁচালী/প্রথম পরিচ্ছেদ]

খ. [১৯৩২]

তখনও এই রকম বৈকাল, এই রকম কালবৈশাখী নামিবে তিন হাজার বর্ষ পরের বৈশাখ দিনের শেষে! তখনও এই রকম পাখি ডাকিবে, এই রকম চাঁদ উঠিবে। তখন কি কেহ ভাবিবে তিন হাজার বছর পূর্বের এক বিস্মৃত বৈশাখী বৈকালের এক গ্রাম্য বালকের ক্ষুদ্র জগৎটি এই রকম বৃষ্টির গন্ধে, কোড়া হাওয়ায় কি অপূর্ব আনন্দে দুলিয়া উঠিত— এই স্নিগ্ধ অপরাহ্ন তাহার মনে কি আনন্দ, আশা-আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তুলিত? তিন হাজার বছরের প্রাচীন জ্যোৎস্না একদিন কোন মায়াস্বপ্ন তাহার শৈশব-মনে ফুটাইয়া তুলিয়াছিল? নিঃশব্দে শরৎ-দুপুরে বনপথে ক্রীড়ারত সে ক্ষুদ্র নয় বৎসরের বালকের মনের বিচিত্র অনুভূতিরাজির ইতিহাস কোথায় লেখা থাকিবে?

[অপরাহ্ন/চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ]

গ. [১৯৩৪]

আমার মনে হল ভগ্নলমামার বাড়ি উঠেছে আজ থেকে নয়, জীবনের পিছন ফিরে চেয়ে দেখলে যতদূর দৃষ্টি চলে ততকাল ধরে ... যেন অনন্তকাল, অনন্ত যুগ ধরে ভগ্নলমামার বাড়ির ইট একখানির পর আর একখানি উঠেছে— শিশু থেকে কবে বালক হয়েছিলুম, বালক থেকে কিশোর, কৈশোর কেটে গিয়ে এখন প্রথম যৌবনের উন্মেষ, আমার মনে এই অনাদ্যন্ত মহাকাশ বেয়ে কত শত জন্য-মৃত্যু, সৃষ্টি ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ভগ্নলমামার বাড়ি হয়েই চলেছে।

['ভগ্নলমামার বাড়ি' / যাত্রাবদল]

ঘ. [১৯৩৯]

হেমন্তের অপরাহ্নের শীতল বাতাসে পুষ্পিত বন্য সপ্তপর্ণের ঘন বনে দাঁড়াইয়া নিটোল স্বাস্থ্যবতী কিশোরী ভানুমতীর দিকে চাহিয়া মনে হইল, মূর্তিমতী বনদেবীর সঙ্গলাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি— কৃষ্ণা বনদেবী! রাজকুমারী তুমি ও বটেই! এই বনাঞ্চল, এই পাহাড়, এই মিছি নদী, কারো নদীর উপত্যকা, এদিকে বনবরি, ওদিকে নওয়াদার শৈলশ্রেণী— এই সমস্ত স্থান এক সময়ে যে পরাক্রান্ত রাজবংশের অধীনে ছিল, ও সেই রাজবংশের মেয়ে— আজ ভিন্ন যুগের আবহাওয়ায় ভিন্ন

সভ্যতার সংঘাতে যে রাজবংশ বিপর্যস্ত, দরিদ্র, প্রভাবহীন— তাই আজ ভানুমতীকে দেখিতেছি সাঁওতালী মেয়ের মত । ওকে দেখিলেই অলিখিত ভারতবর্ষের ইতিহাসের এই ট্র্যাজিক অধ্যায় আমার চোখের সামনে ফুটিয়া উঠে ।

[আরণ্যক]

ঙ. [১৯৩৯]

মনে হয় যুগে যুগে এই জন্মমৃত্যুচক্র কোনো এক বড় দেব-শিল্পীর হাতে আবর্তিত হচ্ছে, হয়তো দু-হাজার বছর আগে জন্মেছিলাম ঈজিপ্টে, যেখানে নল-খাগড়ার বনে, শ্যামল নীল (Nile) নদের রৌদ্রদীপ্ত তটে কোন দরিদ্র ঘরের মা, বোন, বাপ, ভাই, বন্ধুবান্ধবদের দলে এক অপূর্ব শৈশব কেটেচে, তারপর এতকাল পরে আবার ষাটটি বছরের জন্যে এসেচি— এখানে আবার অন্য মা, অন্য বাপ, অন্য ভাই-বোন, অন্য বন্ধুজন । পাঁচ হাজার বছর পরে আবার কোথায় চলে যাবো কে জানে ? এই cycle of birth and death যিনি নিয়ন্ত্রিত করছেন আমি তাঁকে কল্পনা করে নিয়েচি— তিনি এক বড় শিল্পী । এই সকল জন্মের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা হয়তো কোন দূর জীবনের উন্নততর, বৃহত্তর, বিস্তৃততর অবস্থায় সব মনে পড়বে— সে এক মহনীয়, বিপুল, অতি করুণ অভিজ্ঞতা ।

[তৃণস্কুর]

চ. [১৯৫০]

সবুজ চরভূমির তৃণক্ষেত্রে যখন সুমুখ জ্যোৎস্নারাত্রির জ্যোৎস্না পড়বে, গ্রীষ্মদিনে সাদা থোকা থোকা আকন্দফুল ফুটে থাকবে, সোঁদালি ফুলের ঝাড় দুলাবে নিকটবর্তী বনঝোপ থেকে নদীর মৃদু বাতাসে, তখন নদীপথ-যাত্রীরা দেখতে পাবে নদীর ধারে পুরোনো পোড়া ভিটের ঈষদুচ্চ পোতা, বর্তমানে হয়ত আকন্দঝোপে ঢেঁকে ফেলেচে তাদের বেশি অংশটা, হয়তো দু-একটা উইয়ের টিপি গজিয়েচে কোনো কোনো ভিটের পোতায় । এই-সব ভিটে দেখে তুমি স্বপ্ন দেখবে অতীত দিনগুলির, স্বপ্ন দেখবে সেই সব মা ও ছেলের, ভাই ও বোনের, যাদের জীবন ছিল একদিন এইসব বাস্তুভিটের সঙ্গে জড়িয়ে । কত সুখদুঃখের অলিখিত ইতিহাস বর্ষাকালে জলধারাঙ্কিত ক্ষীণ রেখার মত আঁকা হয় শতাব্দীতে শতাব্দীতে এদের বুকে । সূর্য আলো দেয়, হেমন্তের আকাশ শিশির বর্ষণ করে, জ্যোৎস্না-পক্ষের চাঁদ জ্যোৎস্না ঢালে এদের বুকে ।

সেই সব বাণী, সেই সব ইতিহাস আমাদের আসল জাতীয় ইতিহাস । মুক জনগণের ইতিহাস, রাজা-রাজড়াদের বিজয়কাহিনী নয় ।

[ইছামতী]

উপর্যুক্ত প্রতিটি উদ্ধৃতিতেই বিভূতিভূষণের ইতিহাসবোধ ও কালচেতনার পরিচয় সুস্পষ্ট। এই ইতিহাসজ্ঞানের কারণেই কালিক নির্বেদ-নিঃসঙ্গতা আর বিসঙ্গতি-বিদ্রোহ থেকে তিনি নিজেকে রাখতে পেরেছেন মুক্ত। বিভূতিভূষণের রচনায় ইতিহাসজ্ঞান ও কালচেতনার প্রকাশ ঘটেছে দ্বিবিধ উপায়ে— কখনো কালকে তিনি ব্যবহার করেছেন আনুভূমিক (horizontal) বিন্যাসে, যেখানে জীবনকে তিনি ধরতে চেয়েছেন বিশাল ইতিহাসের ক্যানভাসে— সময় সেখানে বিপ্রতীপ মাত্রায় প্রবাহিত হয়েছে অতীত থেকে বর্তমানের মানবসমুদ্রে, যেমন ঘটেছে ইছামতী উপন্যাসে। পক্ষান্তরে, কখনো-বা কালপ্রবাহ ব্যবহৃত হয়েছে উল্লম্ব (vertical) বিন্যাসে, যেখানে জীবন প্রবাহিত হয়েছে বর্তমান থেকে অজানা ভবিষ্যতের দিকে— কালপ্রবাহের সঙ্গে-সঙ্গে ক্রমশ হয়ে-ওঠা কোন-এক ব্যক্তিমানুষের আধারে গোটা মানবপ্রজাতি অগ্রসর হয়েছে প্রগত এক আলোকিত ভুবনে, যেমন দেখি পথের পাঁচালী-অপরাজিত উপন্যাসে। বর্তমান আলোচনায় কাল-বিষয়ক উদ্ধৃতি পুঞ্জের গ, ঘ, চ-অংশে আনুভূমিক পদ্ধতির এবং ক, খ, ঙ- অংশে উল্লম্ব পদ্ধতির কালচেতনার প্রকাশ ঘটেছে।

৩.৩

সামসময়িক সাহিত্যধারায় বিভূতিভূষণের প্রাতিস্বিকতার আর-এক উল্লেখযোগ্য প্রাপ্ত তাঁর স্বতন্ত্র প্রকৃতিভাবনা। তাঁর কথাসাহিত্যে, এমন-কি দিনলিপি-তেও, প্রকৃতি পরিপ্রেক্ষিত হিসেবে থাকেনি, হয়ে উঠেছে ছোটগল্প বা উপন্যাসের অন্তর্গত এবং অনিবার্য চরিত্র : তিরিশের প্রেরণায় প্রকৃতি যেখানে মৃতপ্রায়, সেখানে বিভূতিভূষণ প্রকৃতির মাঝে অবগাহন করলেন জীবনের সান্ত্বনা আর শুশ্রূষার অফুরন্ত উৎস-আবিষ্কারে। মানুষ এবং প্রকৃতির গভীর ঐক্যাত্ম্য উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন :

মানুষের মনে এই জ্ঞানটা শুধু পৌছে দিতে হবে যে, সে ছোট নয়, সে বড়, সে অনন্ত ! যদি যুগে যুগে অর্থাৎ যাই তা হলেও তে' ও রকম কত কালবৈশাখী, কত মুচুকুন্দ চাঁপার গন্ধ, কত টক কলাইয়ের ডাল আমার হবে।

কিন্তু প্রকৃতির নিরাবরণ মুক্ত রূপের স্পর্শে এই অনুভূতি খোলে। সুপ্ত অস্বা জাগ্রত হয় চৈত্র-দুপুরের অলস নিমফুলের গন্ধে, জ্যোৎস্না-ভরা মাঠে, আকন্দ ফুলের বনে, পাখীর বেলা-যাওয়া উদাস গানে, মাঠের দূর পারে সূর্যাস্তের ছবিতে, ঝরা পাতারাশির সোঁদা-সোঁদা গুকনো-গুকনো সুবাসে। প্রকৃতি তাই আমার বড়

বিশল্যকরণী— মৃত, মূর্ছিত চেতনাকে জাগ্রত করতে অত বড় ঔষধ আর নাই।

[তৃণাক্ষর]

কেবল বিশল্যকরণী সত্তা নয়, প্রকৃতি বিভূতিভূষণের কাছে হয়ে-ওঠে সৃষ্টিশীলতারও অনন্ত উৎস। জন্ম-মৃত্যুশাসিত জীবন নয়, এ-জীবনের বাইরেও যে আত্মিক বিবর্তনের আর-এক প্রবহমান মহাজীবন রয়েছে, জীবনের এই নিত্যতার জ্ঞান বিভূতিভূষণ অর্জন করেছেন প্রকৃতির রহস্যলোক থেকে। রবীন্দ্রনাথের মতো অবরোহী পদ্ধতিতে নয়, বরং আরোহী পদ্ধতিতে প্রকৃতির সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে বিভূতিভূষণ উত্তীর্ণ হয়েছেন জীবনের পরমার্থলোকে। ব্যক্তি-অস্তিত্বের মানবীয় প্রান্তিক পরিস্থিতি (border-line situations) অতিক্রম করে বিভূতিভূষণের মানুষেরা যে বার-বার অস্তিত্বের চৈতন্যময় ঙ্গঙ্গসত্তায় (authentic being) উত্তীর্ণ হয়েছে, উত্তীর্ণ হয়েছে মানবাত্মার স্বাধীন-অপরাজেয় সঞ্চরণশীল শক্তি-উৎসে [সৈয়দ আকরম হোসেন ১৯৮৫:৮৮]। নিসর্গলোক সেক্ষেত্রে পালন করেছে দূরসঞ্চরী ভূমিকা। বিভূতিভূষণের শিল্পী-আত্মার প্রতীকী-চরিত্র অণু প্রকৃতির মাঝে খুঁজে পেয়েছে সৃষ্টিশীলতার প্রাণপ্রবাহ। মানুষের হয়ে-ওঠার পরমার্থ-প্রেরণা :

এক জায়গায় বনের ধারে ঝোপের মধ্যে অনেক লতাগাছে গা লুকাইয়া একটা তেলাকুচা গাছ। ... তেলাকুচা লতার পাতাগুলো সব শুকাইয়া গিয়াছে, কেবল অগ্রভাগে ঝুলিতেছিল একটা আধা-পাকা ফল। তারপর দিনের পর দিন সে ঐ লতাটার মৃত্যু-যন্ত্রণা লক্ষ্য করিয়াছে।

একদিন দেখিল, গাছটা সব শুকাইয়া গিয়াছে, ফলটাও বোঁটা শুকাইয়া গাছে ঝুলিতেছে, তুল-তুলে পাকা, সিঁদুরের মত টুক-টুকে রাঙা— যে কোন পাখি, বনের বানর কি কাঠ-বিড়ালীর অতি লোভনীয় আহাৰ্য। যে লতাটা এতদিন ধরিয়া ন'কোটি মাইল দূরের সূর্য হইতে তাপ সংগ্রহ করিয়া, চারপাশের বায়ুমণ্ডল হইতে উপাদান লইয়া এ উপাদেয় খাবার তৈয়ারী করিয়াছিল, তাহার জীবনের উদ্দেশ্য শেষ হইয়া গিয়াছে— ঐ পাকা টকটকে ফলটাই তাহার জীবনের চরম পরিণতি! ...

সে কি ঐ সামান্য বন-ঝোপের তেলাকুচা-লতাটার চেয়েও হীন হইবে? তাহার জীবনের কি উদ্দেশ্য নাই? সে জগতে কি কিছু দিবে না? ... তেলাকুচা লতাটা শুকাইয়া গিয়াছে : কিন্তু সে জীবন দিয়া ফলটাকে মানুষ করিয়া গিয়াছে যে। আত্মদানের ফল বৃথা যাইবে না। কত গাছ গজাইবে বীজে—

[অপরাজিত/ বিংশ পরিচ্ছেদ]

বিভূতিভূষণের কথাসাহিত্য দ্বৈত প্রকৃতির উপস্থিতি লক্ষণীয়— একদিকে পল্লিপ্ৰকৃতি, অন্যদিকে মহাকালের আরণ্যক প্রকৃতি। কিশোরের চিরন্তন রহস্যময়তা ও বিশ্বয়বোধ দিয়ে তিনি অঙ্কন করেছেন পল্লি-প্রকৃতির নিরাভরণ রূপ। বাঙালি-জীবনের হাজার বছরের বিশ্বস্ততা ও গীতময়তা অভিব্যক্তি হইয়াছে বিভূতিভূষণের পল্লিচিত্রে; যে-পল্লি আমাদের পরিচিত তাকেই তিনি অপরিচয়ের ব্যঞ্জনা দিয়ে করে তুলেছেন চিরকালীন। এই যে পরিচিতকে অপরিচিতকরণ, উত্তর-আধুনিকতাবাদী সাহিত্য-সমালোচনায় যাকে বলা হয় de-familiarization, এই বৈশিষ্ট্য কেবল তিরিশের পটভূমিতেই নয়, শতাব্দীর প্রেক্ষাপটেই বিভূতিভূষণের প্রকৃতিবোধের স্বাতন্ত্র্যনির্দেশক। পথের পাঁচালী- অপরাজিত, ইছামতী প্রভৃতি উপন্যাসে এবং অনেক গল্পে আমরা এরূপ পল্লিপ্ৰকৃতির সাক্ষাৎ পাই, যে-প্রকৃতি পরিচিত বলয়েই আমাদের কাছে নিয়ে আসে অপরিচয়ের ব্যঞ্জনা।

আরণ্যক-প্রকৃতির মাঝে বিভূতিভূষণ খুঁজে পেয়েছেন জীবনের প্রবহমানতার ইতিহাস-উৎস। জীবনকে প্রবহমান ইতিহাসের পটভূমিতে দেখানোর জন্যই তিনি ব্যবহার করেছেন মহাকালের প্রকৃতি, যে-প্রকৃতি জন্ম-মৃত্যু-শাসিত জীবনের বাইরে এক মহাজীবনের সন্ধান দেয় মানুষকে। দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞানে উত্তরণের উৎসরূপে এই যে মহাকালের প্রকৃতি-ব্যবহার-বাংলা কথাসাহিত্যে এ প্রশ্নে বিভূতিভূষণ স্বয়ংস্বতন্ত্র, অপ্ৰতিম। পথের পাঁচালী - অপরাজিত উপন্যাসের অমরকণ্টক এবং আরণ্যক উপন্যাসের ফুলকিয়া-বইহার-লবটুলিয়ায় আমরা এই মহাকাল প্রকৃতির বিশাল রূপ লক্ষ করি।

বিভূতিভূষণ বিশ্বাস করেন, প্রকৃতি ও মানুষের সামঞ্জস্যের মধ্য দিয়েই প্রবাহিত হয় জীবন। তিনি গভীর আস্থা রেখেছেন প্রকৃতি ও মানুষের ডায়ালেকটিক্সে, তাই তাঁর রচনায় প্রকৃতি ও মানুষ বিজড়িত, একীভূত। মানুষের জীবন থেকে প্রকৃতি অপহৃত হলে মৃত্যু ঘটে মানুষের আত্মিক স্বাতন্ত্র্যের। আরণ্যক উপন্যাসে তাই দেখি, সভ্যতার স্পর্শে প্রকৃতি যখন ধ্বংসের মুখে, তখন বিভূতিভূষণের আরণ্যক মানুষেরা হয়ে পড়ে শঙ্কিত বিপদগ্রস্ত। অনুভূতিময় মন নিয়ে নষ্টালজিক দূরত্ব থেকে তিনি অবলোকন করেছেন প্রকৃতিকে; তাই ভাগলপুরের প্রকৃতিলোকে বসে তিনি লেখেন পথের পাঁচালী - অপরাজিত, আর কলকাতায় বসে আরণ্যক। প্রকৃতি বিভূতিভূষণকে তাত্ত্বিক স্বাতন্ত্র্য নয়, বরং আত্মিক স্বাতন্ত্র্যের গান শোনায়। পঞ্চইন্দ্রিয়ময় প্রকৃতি, এভাবে, বিভূতিভূষণের কাছে হয়ে ওঠে মানবপ্রতিম, মানবাত্মারই সমার্থক কোনো প্রাণ-উৎস।

৪.

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যে শতবর্ষের বাংলাদেশ উদ্ভাসিত যেন। দার্শনিক আর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞান উচ্চারণ করতে গিয়ে তিনি ভুলে যান নি চিরচেনা তাঁর এই দুঃখিনী বাংলাদেশকে, বাংলাদেশের অফুরন্ত প্রাণ-উৎসকে। গোটা বাংলাদেশ, বাংলাদেশের শহর-বন্দর-পল্লি বিভূতিসাহিত্যে সুপ্ত হয়ে আছে যেন। ১ শতাব্দী-পূর্বে বাংলাদেশের পল্লিজীবন কেমন ছিল, তা জানতে হলে আমাদের যেতেই হবে বিভূতিভূষণের কাছে, তাঁর নিশ্চিন্দীপুরে, তাঁর ইছামতীর তীরে-তীরে। কেবল আধ্যাত্মিক পরমানন্দ এবং মানবাত্মার অপরাজেয় গৌরবগাথা নয়, সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না মহামারী-মন্ত্রস্তরময় বাংলাদেশের একটি অখণ্ড পরিচয়ের শিল্পরূপ আছে বলেই বিভূতিসাহিত্য বাঙালি পাঠকের কাছে আজও এত জনপ্রিয়। বাংলার পল্লিপ্রকৃতি, মানুষের সামাজিক স্তরবিন্যাস, বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা-সমাজনীতি-রাজনীতি এবং পারিবারিক জীবনের যে নিগূঢ় পরিচয় বিভূতিভূষণের সাহিত্যে উদ্ভাসিত, তা-ই সমকালের প্রেক্ষাপটে তাঁকে এনে দিয়েছে ঈর্ষণীয় স্বাতন্ত্র্যের জয়মালা।

৫.

কেবল বিষয়াংশ নয়, বিষয়াংশের শিল্পরূপ-সৃজনেও বিভূতিভূষণের প্রাতিস্বিকতা সবিশেষে উল্লেখযোগ্য। জীবনার্থের শিল্পরূপ-সৃজনে তিনি মূলত নির্ভর করেছেন মানুষের আবেগ-জীবনের উপর। এক বিশাল কবিদৃষ্টি দিয়ে তিনি জীবনকে দেখেছেন, ফলে তাঁর সংগঠনশৈলীতে, তাঁর ভাষায় সর্বদা লেগেছে কবিতার লাভণ্য। পুরাণকথা বা *মীথের* অবভাসে চরিতমূলক উপন্যাস (Biographical Novel) সৃষ্টি করে বাংলা কথাসাহিত্যে তিনি নির্মাণ করেছেন নতুন এক মাত্রা। *মীথ*-কাহিনীর সমান্তরালে, কৃষ্ণের রূপকে, অপরাজিত মানবাত্মার প্রতীক-রূপে নির্মিত হয়েছে অপু-চরিত্র : কৃষ্ণই হয়ে-ওঠে অপু— পুরাণের মৃগালে ফোটে সমকালের পঙ্কজ। বস্তুত, পথের *পাঁচালী*- *অপরাজিত উপন্যাসের* অস্থিতে প্রবহমান আছে *মীথ*, শোণিতে সমকাল। প্রসঙ্গত স্মরণীয় সমালোচকের এ-মন্তব্য:

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-শাসিত, যুদ্ধকালীন বিপন্ন মূল্যবোধ-আচ্ছন্ন, বিকৃত-লাঞ্ছিত কলোনি-শহরের ... জুর বাস্তবতার আর-এক নাম কংস। যে সামন্তশক্তিকে শাসনচ্যুত করে বণিজ্যপুঞ্জি-শিল্পপুঞ্জি রূপে সমাজশক্তি-রাজ্যশক্তিকে করেছিল অধিকার। সেই কংস-রূপ অপশক্তির আঘাত, মন্ত্র-যড়যন্ত্র, লোভ-প্রলোভনের এবং আতঙ্কের বিরুদ্ধেই সংগ্রাম অপু। অপু-তো উপন্যাসিকের জাগরচৈতন্য এবং জাতির দ্বন্দ্বিক অতীন্সার প্রাগ্রসর-বিন্দু [সৈয়দ আকরম হোসেন ১৯৮৫ : ৮৭]।

৬.

মানুষ, প্রকৃতি, পরজগৎ— এই ত্রিমাত্রিক অভিজ্ঞান-সূত্র সমকালীন বিকৃতি ও বিবমিষা থেকে মুক্ত রেখেছে বিভূতিভূষণকে। শতাব্দীর গরল কণ্ঠে ধারণ করেও, নীলকণ্ঠের মতো, মানুষকে তিনি শুনিয়েছেন পরমার্থ-সঙ্গীত। অপরাডেয় মানবাত্মার প্রশ্নে কখনো সন্দিগ্ধ হতে হয়নি বিভূতিভূষণকে। নষ্ট শসা, পচা চালকুমড়া, ঝাড়া পালক আর মরা-হেমন্তের বহুবন্ধিম বহুবিস্তৃত রক্তাক্ত পথ পেরিয়ে ইতিহাসচেতনার আলোকে জীবনানন্দ আবিষ্কার করেছিলেন জীবনপ্রবাহের 'শত-শত জল ঝর্নার ধনি'। বিভূতিভূষণকে কিন্তু ওই বহুবন্ধিম বহুবিস্তৃত রক্তাক্ত পথে হাঁটতে হয় নি; প্রথম থেকেই তিনি যুধিষ্ঠিরপ্রতিম, প্রথম থেকেই তিনি মুক্ত কালিক বিপন্নতা বিভঙ্গতা-বিসঙ্গতি-থেকে।

বিভূতিভূষণের সাহিত্যে শিল্প-সিদ্ধির প্রশ্নে বিতর্ক থাকতে পারে, অভিযোগ উঠতে পারে তাঁর ভাববাদী চিন্তা নিয়ে, হারিয়ে যেতে পারে বিশেষ নামধারী কোনো চরিত্র, কিন্তু অম্লান থাকবে তাঁর সদর্থক জীবনবীক্ষণ রীতি। জীবনবীক্ষণের প্রশ্নে তাঁর অকৃত্রিমতা ও সহানুভূতি-সিদ্ধ আত্মিক দৃষ্টিভঙ্গিই শতবর্ষের বাংলা সাহিত্যে তাঁর স্বাতন্ত্র্যের স্বারক। তাই, আধুনিকতা, উত্তর-আধুনিকতা কিংবা যতই আসুক আরো নতুন মতবাদ— এক শতাব্দী নয়, কয়েক শতাব্দীর সীমানা পেরিয়েও উজ্জ্বল হয়ে বেঁচে থাকবে তাঁর অপু-জিতু-রা: তাঁর দুর্গা, মঞ্চী, ভানুমতী, মুসন্মত, কুস্তা, মটুকনাথ, যুগলপ্রসাদ, ধাতুরিয়া, যদু মাস্টার, মালতী, পদ্ম কিংবা ইন্দির ঠাকুরাণ দীর্ঘদিন বেঁচে থাকবে বাংলাভাষী মানুষের চিত্তলোকে।

টীকা

৭. বিস্তৃত ব্যাখ্যার জন্যে দৃষ্টব্য, সৌরেন বিশ্বাস : ১৯৯০।

গ্রন্থপঞ্জি

অচিন্তকুমার সেনগুপ্ত

কল্লোল-যুগ। কলকাতা।

১৯৮৭

গোপিকানাথ রায় চৌধুরী

বিভূতিভূষণ : মন ও শিল্প। কলকাতা।

১৯৮৯

বুদ্ধদেব বসু

১৯৮২

'আতি-আধুনিক বাঙলা সাহিত্য', *বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ*, ৩য় খণ্ড। কলকাতা।

সৈয়দ আকরম হোসেন

১৯৮৫

'পথের পাঁচালী-অপরাজিত : প্রসঙ্গ গঠনশৈলী', *সাহিত্য পত্রিকা*, ২৮:৩। ঢাকা।

সৌরেন বিশ্বাস

১৯৯০

বিভূতিভূষণের উপন্যাসে শতবর্ষের বাংলাদেশ। ঢাকা।

Eliot, T. S.

১৯৬৭

'The Cocktail Party' in *The Complete Plays of T. S. Eliot*. নিউ ইয়র্ক।